Ujagar- Prabandho – Others – Lalki Nadir Bandh, Ebeng … - Debalina Mukhopadhyay (Seth)

উজাগর - লাল্‌কি নদীর বাঁধ, এবং... - দেবলীনা মুখোপাধ্যায় (শেঠ)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে আরিজোনা - নেভাদা সীমান্তে কলোরডো নদীর ওপর নির্মিত হয়েছিল ২২১ মিটার উঁচু হুভার বাঁধ। সময়টা ছিল ১৯৩২। সেদিন আমেরিকাবাসী সম্মোহিত হয়েছিল বাঁধের বিশালতায়। বাঁধ দেখে অভিভূত আমেরিকার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকও ঔপন্যাসিক ওয়ালেম স্টেগনার মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছিলেন, এ-ই তো চাই! প্রকাণ্ড গঠন, আকাশছোঁয়া সিঁড়ি - এই দম্ভই তো আমেরিকার নিজস্ফবৈশিষ্ট্য! পিট সীগারের গুরু মহান লোকসংগীত গায়ক উডি গাথরি তো ১৯৪১ -এ গানই বেঁধে ফেললেন

'Now what we need is a great big dam,
To throw a lot of water across that land
People would work and stuff would grow
And you could wave goodbye to the old skid row.'
('Washigton Talking Blues')

আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত বাঁধ ছিল এক মস্ত ভরসা - বাঁধ ঘিরে বিশ্বজোড়া মানুষের নানা প্রত্যাশা। মনে পড়বে ষাট-সত্তরের দশকের আকাশবাণী থেকে বহুবার সম্প্রসারিত এক বাংলা নাটক- 'রাক্ষসী'। কাহিনিকার ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সদ্যবিবাহিত এক তরুণ বর্ষাশেষে পুজোর মুখে কিশোরী স্ত্রীর কাছে দূরদেশ থেকে ফেরার পথে মুহূর্তের অসাবধানতায় ভেসে যায় রাক্ষসী দামোদরের বন্যায়। বিধবা কিশোরীর দুঃখ-কান্না সেদিন মিলে মিশে গেছিল পরিপ্লাবিত দামোদরের জলে।কাঁদতে কাঁদতেও আশ্বস্ত হয়েছিল মেয়েটি, কেননা গ্রামের শিক্ষিত মানুষ তাকে জানিয়েছিল, এইবার কষে বাঁধ দিয়ে বাঁধা হবে উৎশৃঙ্খল দামোদরকে। আর কোনো মেয়ের কপাল পুড়বে না তার মত। দামোদর - অজয় - বরাকরের দূরবর্তী আকাশবাণীর শহুরে শ্রোতারাও সেদিন কিন্তু আশ্বাসই খুঁজে পেয়েছিল বাঁধ নির্মাণের সংবাদে। শুধু বেতার নাটকই বা কেন - ভাক্‌রা - নাঙ্গালের উদ্বোধনে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বিমুগ্ধ বিস্ময়ে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করে ফেললেন 'কী প্রকাণ্ড! কী অসাধারণ কীর্তি! এরকম কাজের দায়িত্ব শুধু সেই দেশই নিতে পারে যার নিজের ওপর বিশ্বাস আছে, সাহস আছে। দেশ যে শক্তি, সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে তৈরি, এ বাঁধ তারই এক নিদর্শন।' পরদিন ভারতের বহুভাষী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল সেই অভিভাষণ।

লাল্‌কি নদীর ওপর নির্মীয়মান বাঁধ দেখে ছেলেবুড়ো সকলেরই মনে হয়েছিল, 'লাল্‌কি নদীর বাঁধটা সত্যিই একটা কীর্তি।... যেন বিশ্বকর্মার কিরীট।' আর যন্ত্ররাজ বিভূতির বহুবছরের চেষ্টায় নির্মিত লৌহযন্ত্রের বাঁধ দেখে পথিকের ভয়মিশ্রিত বিস্ময় 'বাবারে! ওটাকে অসুরের মাথার মত দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা... হঠাৎ ঐটের দিকে তাকিয়ে আজ আমার গা শিউরের উঠল।' 'অভ্রভেদী লৌহযন্ত্র' নির্মাণের 'অসামান্য কীর্তিকে পুরস্কৃত' করার জন্য উত্তরকূট উৎসবের আয়োজন। শিল্পবিপ্লব বুঝতে শুধু উৎপাদন। প্রাকৃতিক শক্তিগুলিও উৎপাদন - সহায়ক অর্থাৎ সম্পদের উৎস। সুতরাং প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকেও নিজেদের সুবিধামত 'কাজে লাগাতে' হবে। -এই চিন্তা থেকেই জলনিয়ন্ত্রণের ভাবনা। উত্তরকূটের রাজা বাঁধটাকে ব্যবহার করে বশে আনতে চেয়েছিল শিবতরাইয়ের দুর্বিনীত প্রজাদের - আর লাল্‌কি নদীর বাঁধ পতিত নিমিয়াঘাটের জমিতে সোনা ফলাতে চেয়েছিল। লাল্‌কি নদীর খামখেয়াল' শান্ত করে দিতে হবে।' 'রুক্ষ নিমিয়াঘাট সবুজ হয়ে উঠবে'। জল ব্যবহৃত হবে আমাদেরই ইচ্ছাধীন হয়ে। অথচ সৃষ্টির আদিতম কাল থেকে নদী তার নিজের খেয়ালখুশিতে চলতে চলতে পথ খুঁজে খুঁজে তৈরি করে এসেছে নিজস্ব প্রবাহপথ। তার বহতা আর পথপরিবর্তনের মধ্য দিয়েই জেগে উঠেছে বসতিযোগ্য ভূমি। সুপ্রাচীন সমস্ত সভ্যতাই গড়ে উঠেছিল স্বচ্ছতোয়া কোনো-না-কোনো নদীর আশীর্বাদে। নীল - সিন্ধুনদ, হোয়াংহো, ইয়াং সিকিয়াং বা মেকং, টাইগ্রিস কিম্বা ইউফ্রেটিস' - সুপ্রাচীন ইতিহাস লেখাই যায় না নদীকে বাদ দিয়ে। সেদিন নদী আর ভূমির সাহচর্যেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আর সেই সভ্যতারই বিচিত্র এক পর্যায়ে দম্ভী মানুষ যন্ত্রের শক্তিকে চরম ভেবে সেই নদীকেই বশে আনার জন্য উঠে পড়ে লাগল। পরিসংখ্যান বলে, ১৯৩২ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে পৃথিবীতে পাঁচ হাজার বড় বাঁধ তৈরি হয়েছিল। আর ১৯৯৮ তে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়ে ছিল চল্লিশ ওাজার। কী বিপুল অর্থব্যয়। বোঝানো হয়েছিল মানুষকে, বাঁধ নদীর ক্ষতিকর দিকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ কিম্বা বন্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে নতুন সভ্যতার দিগন্ত খুলে দেবে। বাঁধ নিয়ে মানুষের তাই কতই না উৎসাহ!

ছিল অবশ্যই পিট সিগারের মত কোনো কোনো সচেতন মানুষ, যারা ষাটের দশকেই সরব হয়েছিলেন বাঁধের বিরুদ্ধে। তাঁর নেতৃত্বে হাডসন নদীর বুকে 'ক্লিয়র ওয়াটার ফেস্টিভ্যাল' আজ বাঁধ - বিরোধী আন্দোলনকারীদের কাছে দীপ্ত প্রেরণা। গানের সুরে পিট সিগার চেয়েছিলেন, হাডসন সবুজে - জলে - বন্যায় - অবাধ্যতায় আবার হয়ে উঠুক তাঁর ছেলেবেলার নদী। বাঁধ কেড়ে নিলনদীর স্বাধীনতা। হারিয়ে গেল নদীপালিত জীববৈচিত্র্য। কলোরডো থেকে নীপার, হোয়াংহো থেকে ড্যানিয়ুব, কৃষ্ণাকাবেরী থেকে গঙ্গা - শৃঙ্খলিত হল একের পর এক নদী। বহমানতাই যার প্রাণস্পন্দন, বাঁধ রচনা করল তার সমাধিক্ষেত্র। আসলে বড়বাঁধ মানেই নদীর নিশ্চিত মৃত্যু। বাঁধ দেওয়া মানেই শ্বাসরোধ করে একের পর এক নদীকে নির্মমভাবে হত্যা। তারই সঙ্গে ধ্বংস করা সে-নদীর দুই তীরের নদীপালিত সভ্যতা, সমৃদ্ধি, ইতিহাস আর প্রাণীসম্পদ। মস্ত কোনো সম্ভাবনাময় অগ্রগতির ইঙ্গিত নয় - 'a reservoir is the antithesis of river.'

আমরা ভুলিনি ভাক্‌রা-নাঙ্গালকে ঘিরে আত্মতুষ্টি। তারপর পঞ্চাশটা বছরও পেরলো না। হাতে এল ২০০০ সালের 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার মে -সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত বন্যা নিয়ে একটুকরো খবর 'রিজার্ভারের জল বিপদসীমা অতিক্রম করায় মশানজোড় ও ডি.ভি.সি-র বাঁধগুলো খুলে দিতে হয়েছে, অতর্কিত এই জলপ্লাবনে পশ্চিমবাংলার ন'টি জেলা সম্পূর্ণভাবে প্লাবিত হয়েছে। প্রবল বন্যায় অন্তত চার হাজার মানুষ ওলক্ষ লক্ষ গবাদি পশুর প্রাণহানি ঘটেছে। কয়েক হাজার হে*র কৃষিজমি তিন-চার - মিটার বালির আস্তরণে চাপা পড়েছে।' ২০০০-এর বন্যায় গ্রাম ও শহরগুলি একই রকম বিপন্নতার মধ্য দিয়ে জেনে নিল, বাঁধের অন্ধকার দিকটা হাত বাড়াচ্ছে আমাদের বাঁচা - মরার লড়াইয়ে। মানবকল্যাণের সাপেক্ষে নয়- বাঁধ আজ নিয়ত - আলোচিত মানবসংহারের নিষ্ঠুর হাতিয়ার - রূপে।

বড়ো বাঁধ মানে নদীর মৃত্যু এবং সভ্যতার অপমৃত্যু। স্থানীয় মানুষদের উৎখাত করে তাদের রক্ত দিয়ে বাঁধের মশলা মাখাহয়। তিলক রায় বিশ্বাস করত, 'একশোটি নরবলি না দিলে লাল্‌কি নদী কখনই তুষ্ট হবে না।' ১৯৮১ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রীশৈলম বাঁধের কাজে এক লক্ষ আদিবাসীকে চিরকালের বাসভূমি থেকে উৎখাত করা হয়। ভিয়েতনামের হোরা-বিন বাঁধের জন্য কৃষিজমি থেকে বিতাড়িত লক্ষাধিক কৃষক। অপুষ্টি আর অনাহারে অনিবার্য মৃত্যু ঘনিয়ে আসে অধিকাংশ কৃষকদের জীবনে। ১৯৯৮ সালে প্রদত্ত বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে বিগত শতাব্দীতে ১,৯৬৫,০০০ লোক প্রযুক্তির তাগিদে বাসভূমি খুইয়েছে। ৬৩ক্ষ লোক ভিটোমাটি হারিয়েছে বাঁধ তৈরির পরিণামে। এ কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য, পাঁচ বা ছয় দশকের পরেও বড়ো বাঁধ তৈরির পরিণামে। এ কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য, পাঁচ বা ছয় দশকের পরেও বড়ো বাঁধের প্রবক্তারা বোঝেনি ঝুঁকির দিক বা বিপদের সম্ভাবনা? আসলে বিশ্বব্যাঙ্কের পুঁজিখাটিয়ে মুনাফা আদায়ের সহজ উপায় ছিল ভারত, আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অবাধে শোষণ - তারই সাপেক্ষে তৈরি হয়েছিল বাঁধকে নিয়ে মেকি কতগুলো যুক্তিপরম্পরা। আমাদের ভারতের মত দেশগুলো বুঝতে বুঝতে সময় নিল বানিচ্ছে অনেকদিন।

বাঁধের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের গণপ্রতিবাদের ইতিহাসটা দেখে নেওয়া যাক সংক্ষেপে। এদেশে বাঁধবিরোধী আন্দোলনের মোকাবিলায় সরকারি দমননীতির যে নিদর্শন, তা বর্বর এবং লজ্জাজনক। ১৯৪৬ সালে হিরাকুঁদ বাঁধের জন্য ছিন্নমূল তিরিশ - হাজার মানুষ এক প্রতিবাদী মিছিলে পথে নেমেছিল। পুলিশের বেপরোয়া লাঠি চলেছিল তাদের ওপর। ডি.ভি.সি.-র বাঁধগুলো তৈরির সময় উচ্ছিন্ন অগণিত মানুষ বাঁধের জল ছাড়ার সময় গ্রাম - খোয়ানো হাজার হাজার মানুষ হতদরিদ্র, ভবিষ্যৎহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণতহয়। প্রতিবাদ জানাতে গেলে পিঠে পড়ে পুলিশের চাবুক - এই স্বাধীন ভারতেও। শাসকগোষ্ঠী বোধহয় সবদেশে সবকালে একইরকম। মনে পড়বে 'মুক্তধারা'য় বিভূতির নিষ্ঠুর নৈর্ব্যক্তিক অহংকার 'বালি - পাথর - জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী, এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষির কোন্ ভুট্টার খেত মারা যাবে, সেকথা ভাববার সময় ছিল না।' সত্তরের দশকের পুরুলিয়া ও টাটার মধ্যবর্তী চাণ্ডিলে সুবর্ণরেখাকে বাঁধে বাঁধার আয়োজন শুরু হয়। আদিবাসীদের অসংখ্য গ্রাম ছারখার হয়ে যায়। ১৯৭৮-এর মার্চে বাঁধের প্রস্তাবিত জমিতে প্রায় একলক্ষ মানুষ জমায়েত হয়ে প্রতিবাদ জানায়। পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেয় চারজন। ঐ সুবর্ণরেখার বুকেই ইচাবাঁধ-পরিকল্পনাও প্রতিবোধের সম্মুখীন হয়। পুলিশের অকথ্য অত্যাচারে ১৯৮২তে প্রাণ হারায় বাঁধ বিরোধী সেই আন্দোলনের রূপকার, আদিবাসী নেতা গঙ্গারাম কালুণ্ডিয়া। ১৯৮৩ তে ভারতে বাঁধবিরোধী আন্দোলন প্রথম জয়যুক্ত হয়। সত্তরের দশকে উত্তর কেরালার চিরসবুজ বনাঞ্চল সাইলেন্ট ভ্যালিতে মস্ত বাঁধ আর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন।' ৮৩তে গণপ্রতিবাদে চাপে পরিত্যক্ত হয় সেই পরিকল্পনা। উত্তাল হয়ে ওঠে এরপর বিহার, কারো - কোয়েল প্রকল্পেরবিরুদ্ধে কিম্বা উত্তরপ্রদেশ তেহরী বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রতিবাদে। শ্লোগান সর্বত্রই, দেশের নদী, নদীর জলেও এনে দিল ভাগাভাগির প্রশ্ন। মুর্শিদাবাদে

দ্বিধা বিভক্ত গঙ্গা ১৯৭০-এ পরলো কংক্রিটের মালা। গড়ে উঠলো ফারাক্কা বাঁধ। শুরু হল ভারত - বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) মধ্যে জল বন্টন চুক্তি। কিন্তু নদীর স্বাভাবিক ধারাকে বন্দী করে এক প্রবাহকে অন্যমুখী করে দেওয়ার কারণে স্বাধীন বাংলাদেশ যখন পদ্মাতে পেল না পর্যাপ্ত জল, তখন ১৯৭৬-এর ১৬মে মৌলানা ভাসানি সুদূর রাজাসাহী থেকে ফারাক্কা বাঁধ পর্যন্ত করলেন 'ফারাক্কা মার্চ'। বাঁধবিরোধী আন্দোলনে এ-ও এক আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ।

আর নর্মদা - বাঁচাও আন্দোলন বা ত্বষ্ট্র -র লড়াই তো আজ ইতিহাস। 'We will not move':

'কোঈ নহী হটেগা
বাঁধ নহী বনেগা।'

আদিবাসী জনতা আর বাঁধবিরোধী গণকর্মীদের উদ্দীপ্ত শ্লোগান স্পর্শ করেছে সমগ্র ভারতবাসীকে। মোটকথা এদেশে বাঁধ যেমন একঅনিবার্য পরিকল্পনা, বিরোধী আন্দোলনও সমান সক্রিয়। তবু নদী মরে। সুর্বণরেখা হারায় সোনালি বালি। প্রবাহহীন নদীতে আজ ভাসে শুধু কারখানার বর্জ্য। ইছামতী হারিয়ে যায় ইটভাটায় আর কচুরিপানায়। অজয়-বরাকর-কাঁসাই-সিলাই জল খুইয়ে বালির স্তূপ! মনে পড়ে 'ভাল রাক্ষসের গল্প'। সোনামন রাজকন্যার মনে একটুও সুখ নেই। কেননা তার প্রিয়সখি নদী হারিয়ে গেছে। জানা যায়'সব - চাই- রাক্ষসে'র পাল্লায় পড়েছে নদী। ভাল রাক্ষসের নেতৃত্বে তাকে উদ্ধারের অভিযান। বাঁধে - বর্জ্যে সত্যিই হারিয়ে যাচ্ছে নদী। বাঁচতে গেলে চাই-ই নদীর পুনরুজ্জীবন। আর বাঁধের বিরুদ্ধে জরুরি প্রতিরোধ। নতুন বাঁধ - আর নয়। সরকারের নতুন মন- ভোলানো প্রস্তাবও নয়। বরং হারানো নদীর বহতাকে খুঁজে আনা হতে পারে আমাদের আগামী কয়েক দশকের মস্ত চ্যালেঞ্জ।

বাঁধ নিয়ে বিপর্যস্ত, যুবক অভিজিতকে দেখেছি আমরা 'মুক্তধারা'য়। পণ ছিল তার, 'জন্মকালের ঋণশোধ করতে হবে। স্রোতের পথ আমার ধাত্রী। তার বন্ধন মোচন করব'। বিভূতির মস্ত বাঁধ দেখে বিশ্বজিতের তিরস্কার রাজা রণজিৎকে, 'বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্য দেবদেবের কমণ্ডলু যে জলধারা ঢেলে দিচ্ছেন, সেই মুক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন?' বিভূতির পঁচিশ বছরের সাধনা সত্যিই মিথ্যে হয়ে যায় প্রাণের বিনিময়ে অভিজিৎ বাঁধ ভাঙে। আবার ছোটে 'মুক্তধারা'। শুধু যাওয়ার সময় মায়ের পরম স্নেহে কোলে তুলে নিয়ে যায় অভিজিৎকে। আসলে প্রকৃতির ওপর ইট - কাঠ - লোহার চক্রান্ত মানতে পারেনি অভিজিৎ বা বিশ্বজিৎ। তাই প্রাণ দিয়েই বিপন্ন নদীকে বাঁচায় অভিজিৎ - মুক্তি দেয় বন্দী নদীকে।

লাল মাটির দেশের চালচুলোহীন এক ভবঘুরে 'ভাট তিলক রায়'। কখনো সে বহুরূপী সাজে - কখনো গানের সুরে রূপকথার গল্প বলে। তার চারদিকের পৃথিবীটা কিভাবে কতটা বদলাচ্ছে- কিছুই সে জানে না। 'বুন্‌ডুক্‌টুরু গাহায় রাজার ছেলে মুলুটুংলা আর পৃথিবীর প্রেমের' গল্প বলে পরম মমতায়। তার স্বপ্নরাজ্যের নায়িকা পরে দুর্বাঘাসের পোশাক আর রাজা শিকারে যায় হাতির দাঁতের কুড়ুল নিয়ে। ছোট্ট ছেলের দল তার ছড়ায় - গানে তেমন কিছু না বুঝেও রূপকথার আস্বাদ পেয়ে মুগ্ধ হত। ছোটদের কাছে 'ভাট তিলক রায় তখন ছিল হ্যামলিনের বাঁশীওয়ালা'। বড়ো হয়ে লেখক বুঝেছিলেন, তিলক রায় 'সেই প্রাগৈতিহাসিক বেদের শ্রুতিধর... যখন মানুষ আর পশু একই অরণ্যের জঠরে প্রতিবেসীর মত থাকতো।' তিলক রায় বেঁচেছিল রূপকথা আর ইতিহাসের জগতে। তার ইতিহাসও নেহাতই স্থানিক। কর্ণেল ডাল্টনের বিরুদ্ধে মিউটিনির সর্দার আশি বছরের থুর্‌থুরে বুড়োর কেশর ফুলিয়ে লড়াই করতে করতে রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ার ইতিহাস এ-ও যেন রূপকথা! এর বাইরে তার জগতের আর কিছুই জানা ছিল না। আমরা একালের মানুষ। ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের পরিণামে সৃষ্ট জীব হয়েও ইতিহাসের খপ্পরে আবদ্ধ নই। আমরা বদলে যাই। 'কিন্তু ভাট তিলক ছিল যেন এক নিদ্রাহীন যখ। অতীতের যত পাপ, তাপ, আনন্দ - বিষাদ, প্রেম প্রণয় ও লজ্জা, শত্রুতা প্রতিহিংসা ও প্রতিজ্ঞাকে সতর্ক পাহারায় সে আগলে ছিল।' 'এক মৃত যুগের শবাধার থেকে প্রেতের মত উঁকি দিয়ে' আধুনিক মানুষকে সেকালের কথাসে বারবার মনে করিয়ে দিত। যে কৃপণের মত শুধুই আগলে রাখে - সে যে এগোতে জানে না! ভাট তিলক তাই বুঝতে পারে না পরিবর্তমান কাণ্ডকারখানা। ভয় পায়, সন্দিগ্ধ হয় - পরম সতর্কতায় দূরে রাখতে চায় নিজেকে বদলে যাওয়া বিশ্ব থেকে।

তার বাড়ির কাছেই নিমিয়াঘাট। সেখানে চলেছে মস্ত বাঁধ তৈরির রাজসূত্র যজ্ঞ। কলকাতার জ্যাকব কোম্পানি বাঁধটার কন্ট্যা* নিয়েছে। মালপত্র আসছে, আসছে কুলি, কারিগর, ইঞ্জিনিয়র। তিলকের মনের আগলে রাখা প্রেতটা হঠাৎ সজীব হয়ে উঠল। সে ছড়া বেঁধে গান গাইতে ভুলে গেল। নিমিয়াঘাটের আশেপাশে যত গাঁ, তার মানুষদের সে সতর্ক করতে লাগল 'ভয়ঙ্কর একটা অমঙ্গল আসছে, সময় থাকতে একটা বিহিত ব্যবস্থা করা চাই। লাল্‌কি নদীর বাঁধ তৈরি করতে যারা এসেছে, তাদের উদ্দেশ্য কী? বাঁধ তৈরি এমনিতেই হয়। লাল্‌কি নদীর ঢল সামলাবে সিমেন্ট আর লোহার কয়েকটা দরজা? কেউ নরবলি। 'ছেলেধরার দল ঘুরছে, বাঁধ কোম্পানি টাকার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর একদিন মাঝরাতে হাত-পা বেঁধে বলি দিয়ে লাল্‌কি নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে। ঐ যে একটা নতুন থাম তৈরি হয়েছে, ঐখানে বলি দেওয়া হয়।' নতুন করে ছড়া বাঁধে সেকালের ভাট, একালের আড়ম্বরে বিভ্রান্ত হয়ে। কত মেশিন আসছে, কত ইঞ্জিন, কত কলকব্জা! - তিলকের কাছে সবটাই ষড়যন্ত্র। লোহায় - কংক্রিটে কখনো আটকাতে পারে উচ্ছল লাল্‌কির বহতা?- 'আগে নরবলি হবে, তবেই কল চলবে। তাছাড়া আর কোনো পথ নেই। অতএব সব গাঁয়ের মানুষ হুঁসিয়ার হয়ে যাও। কেউ কুলীর খাতায় নাম লিখিও না, সোনার মোহর মজুরি দিলেও না।'

জলের শক্তিকে বিশ্বাসী মানুষটা ভাবতেও পারে না বিজ্ঞানের শক্তি। প্রকৃতির ওপর চালাকি! নদীকে বাঁধার ভাবনা! ভয় তার, এসব দেখতে দেখতে 'কখন যে গরিবের প্রাণটা চলে যায়, ঠিক নেই। 'নরবলি'র গল্প হয়তো তিলকের রূপকথা। কিন্তু বাঁধ তৈরি করতে গিয়ে ভিটে মাটি খোয়ানো মানুষের নিশ্চিত মৃত্যু দেশের - বিদেশের বাস্তব সত্য। ছেলেরে দলকে সে এক ছড়া শোনায় - তার নিজের রচনা। গানের সুরে জানায়, 'এক একটা থাম উঠছে, আর পাঁচটা মানুষের প্রাণ যাচ্ছে।...নরবলি দিতে হচ্ছে, নইলে মাটিতে থাম ধরবে কেন? লাল্‌কি নদীর রাগ কি এমনিতে শান্ত হবে?' এখানেও মনে পড়বে না-কি 'মুক্তধারা'? হারিয়েই যাওয়া সুমন? কিম্বা বটুর সাবধানবাণী?-

'বটু। সাবধান, বাবা সাবধান। যেয়ো না ও পথে, সময় থাকতে ফিরে যাও।... বলি দেবে, নরবলি। আমার দুই জোয়ান নাতিকে জোর করে নিয়ে গেল, আর তারা ফিরল না।

তা বলি কার কাছে দেবে খুড়ো?

বটু। তৃষ্ণা, তৃষ্ণাদানবীর কাছে।'

সঞ্জয় আর অভিজিৎকে সে জানিয়েছিল তার সজল অভিযোগ যন্ত্রবেদী 'গাঁথবার সময় আমার দুই নাতির রক্ত ঢেলে দিয়েছে। মনেকরেছিলুম পাপের বেদী আপনিই ভেঙে যাবে। কিন্তু এখনো তো ভাঙল না...!'

বটু বা তিলক পরিবেশ আন্দোলন বা বাঁধ বিরোধী আন্দোলন বোঝেনা। বোঝেনা নদীবাঁধের ক্ষণস্থায়ী সুফল বা দীর্ঘস্থায়ী কুফল। মাটির কোল ঘেঁষে বড়ো হতে হতে শুধু এইটেই বোঝে তাদের সহজাত বোধে, নদীকে তার খেয়ালখুশিতে চলতে দিতে হয় ।নইলে বাঁধের মধ্যে জমা হয় জলের শক্তি, নদীর ক্রোধ। তারপর একদিন ২০০০-এর ভয়াল বন্যার মত নেয় তার নির্মম প্রতিশোধ।

আরণ্যক যুগের মানুষ ঐ তিলক রায় যেমন মানতে পারে নি লাল্‌কি নদীর বাঁধ, তেমনি পালামৌ জেলার এক মজার গল্পআছে। গ্র্যা' কর্ড লাইন যখন নতুন তৈরি হয়, তখন কিছুদিন নাকি হাতির উপদ্রব খুব বেড়ে গিয়েছিল। হাতিরা তাদের জঙ্গলে ঐ কলকব্জার অনধিকার প্রবেশ ভাল ভাবে মেনে নিতে পারেনি। তারা নাকি দলবেঁধে লাইনের ওপর বসে থাকতো, শুঁড় দিয়ে লাইন উপড়ে ফেলে তাদের মৌন প্রতিবাদ জানাত। তিলকও যেন ঐ বুনো হাতির দলের মত। তবে চমৎকার তার সাংগঠনিক ক্ষমতা। নিমিয়াঘাটের কাছাকাছি কোনো গাঁ থেকে কোনো কুলি বাঁধ রচনার মধ্যপর্ব পর্যন্ত বাঁধের কাজে যোগ দেয়নি। 'লাল্‌কি নদীর বাঁধ তখনো তাদের কাছে শত্রু হয়ে আছে'। তবে মাঝেমধ্যে তিলক রায় আসে। গুপ্তচরের মত যেন বাঁধের কীর্তি দেখে যায়। সন্দেহ তবু ঘোচেনা। লেখকের বড়মামা জিতেনবাবুকে প্রশ্ন করে তিলক, 'এই বাঁধ তৈরি করে কি হবে? কারো কোনো ভাল হবে কি?' - মনে পড়ে ১৯৫০ থেকে কলোরাডো নদীর অববাহিকার ওপর বিউরেক এবং কালোরাডোর প্রধান উপনদী গ্রীণ-এর ওপর ইকোপার্ক ড্যামের বিরুদ্ধে বাঁধ বিরোধী জন - আন্দোলন প্রথম সংগঠিত হয়েছিল খোদ আমেরিকাতেই। ডেভিড ব্রাওয়ারের নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালে সফল হয়েছিল সেই আন্দোলন। ১৯৭২-৮৩ - ১৪০ টি ক্ষেত্রে জয়মুক্ত হয় বিশ্বের বড়ো বড়ো দেশগুলোর বাঁধবিরোধী আন্দোলনকারীরা। সেই আন্দোলনেই ছিল তিলকের নির্দোষ প্রশ্ন 'কারো কোনো ভাল হবে কি'-র উত্তর।

কিন্তু জিতেনবাবু কি বুঝিয়েছিলেন তিলককে? - 'বলিস কি তিলক দশ বছর পরে নিমিয়াঘাট আর চিনতে পারবি? এখান থেকে চারটে পাকা সড়ক বের হবে - চোস্ত ম্যাকাডাম করা সড়ক। মিটারগেজ রেল বসবে...।' সিমেন্টের কারখানা হবে, বিরাট পাওয়ার স্টেশন হবে... আরো .. আরো কত কি! বাঁধ, নিমিয়াঘাটের শুকনো তৃষ্ণার্ত মাটিকে আর পতিত রাখতে নারাজ। সুতরাং লাল্‌কি নদীর খামখেয়াল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাকে পরাতে হবে এক হাজার ফুট লম্বা এক সুকঠিন কংক্রীটের অলংকার। তবে না ফাল্গুনের বরফগলা জল কিম্বা মৌসুমী বৃষ্টির দুকুল চাপানো জলের প্রসাদ পাবে শুষ্ক নিমিয়াঘাটের অনুর্বর মাটি। সাতটা খাল লাল্‌কি নদীর বাড়তি জলভার নিয়ে ছুটে যাবে দূরদূরান্তে। উর্বরতার অর্ঘ্যে সবুজ হবে রুক্ষ মাটি। জিতেনবাবুর কথায় ছিল ভবিষ্যতের সুখি, সম্পন্ন এক উপনিবেশের স্বপ্ন। যেন একালের এক ভাট, সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের গল্প শোনাচ্ছে সেকালের ভাটকে। কিন্তু 'ইতিহাসের প্রেতটা যেন ভবিষ্যতের ওই ঔদ্ধত্য দেখে মনের দুঃখে মুষড়ে পড়ল'। জিতেনবাবুর স্বপ্নের হাতছানিতে ছিল বাঁধের ফেরিওয়ালাদের চেনা সুর। প্রকৃতির সব উপাদানকে 'কাজে লাগাবার' সাময়িক

লাভের লোভ। যেন নতুন দিনের 'লক্ষ্মীর পাঁচালি'।

সর্দার সরোবর বাঁধের ক্ষেত্রে আজও আমরা শুনছি এমনি কত ছেলেভোলানো গল্প। নর্মদার সেই বাঁধের জল থেকে নাকিসুদূর কচ্ছ বা সুরাটে পানীয় জল সরবহার করবে গুজরাট সরকার। বৃষ্টির জলকে পরিশুদ্ধ করে পানীয়ে পরিণত করার সহজ উপায়ের বদলে, কৃষিজমির ওপর দিয়ে শ'পাঁচেক কিলোমিটার খাল কেটে পানীয় জল সরবরাহের সত্যিই কী চমৎকার পরিকল্পনা। কিন্তুনা বোঝালে অবোধ তিলকেরা একদিন সত্যিই বিশ্বাস করে ফেলে আগামী দিনের সেই অপরূপ কথা। সুবাধ্য ছেলে মত কয়েক শোকুর্মী কুলির খাতায় নামও লিখিয়ে ফেলে তিলকের নেতৃত্বে। নতুন দিনের লক্ষীর পাঁচালির অমোঘ আকর্ষণ তিলকেরা অস্বীকার করতে পারে না, 'তবু চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রশ্ন যেন ঘনিয়ে আছে- এই সুখ সইবে তো?' - দেখতে দেখতে বাঁধের কাজ এগোয়। নিমিয়াঘাটের স্নিগ্ধ প্রকৃতি যন্ত্রের আওয়াজে খানখান। ক্রেনগুলো অনায়াসে ছোঁ মেরে কংক্রীটের চাঙ্গর তুলে নেয়। ডবল সিলিন্ডার ডিজেল ইঞ্জিলগুলো বাঁধ নির্মামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের মতই যেন 'দর্পভরে আত্মহারা'। 'পিনিয়নগুলোর মুখে একটা শানিত দস্তুর হাসি। সমস্ত যন্ত্রযুথ যেন হাসছে।' আর নদী? - নদী কাঁদছে। কেন? - 'একটা প্যাডেল টাগ, একটা ড্রেজার আর একটা এ'ক্যাভেটায় নদীর ওপর পড়ে উৎখাতকেলির আনন্দে অস্থির। হাজার টন জল আর পাথর উপড়ে ফেলছে।' এ যে কণ্ঠরোধ করে নিরীহ এক নদীকে নির্মম হত্যা! বাঁধের ফেরিওয়ালারা যে স্বপ্নই দেখাক না কেন - সবটাই তো 'বেনেদের জুয়ো'। মুনাফা তুলবার কুশলী প্রয়াস। আর জিতে নেওয়ার বাজি এই ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রাকৃতিক উপাদান।

মজুরি বাড়ানোর দাবি মানা হয়নি বলে স্ট্রাইক আরম্ভ হয়েছে। মাঝপথেই কাজ বন্ধ। আধিকারিকরা ছাড়া সবাই নাকি স্ট্রাইকে যোগদানকারী। ময়দানবের পুরী যেন নিঝুম। প্রায় রোজই সমাধানের পথ দেখার জন্য বৈঠক বসে। মজুর-মিস্ত্রী - কেরানিরা সমঝোতায় আসে না। এদিকে আশঙ্কা, বিশ্ববাজারে শেয়ারের দাম পড়বে। মরচে ধরবে যন্ত্রগুলোয়। এত বড়ো এক আয়োজন কি-না পণ্ড হবে শুধু মজুরদের মূঢ়তায়! এই সর্ববিভাগীয় ধর্মঘটে শুধু তিলক রায়ের কুলিদল যোগ দেয়নি। কেননা কাজ নিয়ে, মজুরি নিয়ে তারা মোটের ওপর খুশি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, অবোধ তিলকেরা বিশ্বাস করে ফেলেছে ভবিষ্যতের রূপকথা। স্ট্রাইক মেটে কিন্তু ধর্মঘটী মজুরদের দাবি তিলকের কুলির দল নতুন রেটে মজুরি পাবে না - কেননা তার সমর্থন করে নি ধর্মঘট। এই অবিচারেই শষ নয় - বরখাস্ত করা হল তাদের। নতুন এ'ক্যাভেটর এসেছে। 'ফালতু লোক ছেঁটে ফেলতে হবে।' স্ট্রাইকে যোগ না দিলেও মরজি হলে যে কোনোদিন তো তারা ধর্মঘট করে বসতেই পারে। অজুহাত, তুলনায় মেশিন অনেক বিশ্বস্ত। মানুষ নয় - মেশিন। অর্থাৎ প্রাণ বনাম যন্ত্র আর সেই লড়াইয়ের পরেও অবশ্য সান্ত্বনা আছে 'তোরাই তো ভবিষ্যতের রাজা। এই খালগুলি দিয়ে যখন জল ছুটতে আরম্ভ করবে, তখন তোদের জমির দাম কোথায় গিয়ে উঠবে, ভাবতে পারিস? তোদের মাটিকে কোম্পানি যে সোনা করে দিল রে মূর্খ!' অবশ্য অনাহারের সঙ্গে লড়াইয়ে বাঁচলে তবে সেই কল্প - ভবিষ্যতের রাজার গল্প।

কুর্মী প্রজার দল কুলিবস্তি ছেড়ে যাওয়ার আগে রাত পাঁঠা বলি দিল, মাংস রাঁধল, আকণ্ঠ পচাই খেল। মাতিয়ে দিল বিদায় - উৎসব অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ঝাঁপ দেওয়ার আগে। সেদিন রাতে হঠাৎ জলস্রোতের ভয়াল শব্দে সকলে সচকিত হল। মনে পড়বে আবারও 'মুক্তধারা'।-

'বিভূতি। ও কী শুনি? ও কিসের শব্দ?

ধনঞ্জয়। অন্ধকারের বুকের ভিতর খিলখিল করে হেসে উঠল যে।

বিভূতি। এ তো স্পষ্টই জলস্রোতের শব্দ!

ধনঞ্জয়। নাচ আরম্ভের প্রথম ডমরুধ্বনি।...

বিভূতি। হাঁ হাঁ, সন্দেহ নেই। মুক্তধারা ছুটছে। বাঁধ কে ভাঙলে? কে ভাঙলে? তার নিস্তার নেই।'

বারুদ দিয়ে একটা পিলার স্রেফ উড়িয়ে দিয়েছিল তিলক রায়। এ-ই তার প্রতিবাদ কোম্পানীর অবিচারের বিরুদ্ধে, বাঁধের বিরুদ্ধে এবং নতুন দিনের লক্ষ্মীর পাঁচালির বিরুদ্ধে। জিতেনবাবুর কাছে শুনে ধন্দে পড়েছিল সেকেলে ভাট। আবার স্বপ্নেও দেখেছিল। ভেবেছিল নতুন রূপকথার রূপকার হবে সেও। স্ট্রাইকের থেকেও তাই বিযুক্ত থেকেছিল। হয়তো কুলির খাতায় নাম লিখিয়ে সেকেলে ভাট হারিয়েই ফেলেছিল তার রূপকথার জগৎ। হয়তো নতুন রূপকথার সুর বাঁধছিল মনে মনে। মালিক - শ্রমিক সম্পর্কের আবর্তেপড়ে যখন সুর কাটে - বিদ্রোহী হয় মন। উড়িয়ে দেয় বাঁধের পিলার। উন্মত্ত লাল্‌কি ভাঙা পিলারের গায়ে তাকে থেঁতলে মারে। এ যেন সেকালের রক্তে একেলে সভ্যতার বোধন। ভবিষ্যৎ তাকে স্থান দিল না, ভবিষ্যৎকে সে সইতে পারল না। 'ক্যাপিটাল আর ইন্ডাষ্টির কলের মারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করে সে ফুরিয়ে গেল।' নতুন রূপকথা লেখা হবে না তিলককে নিয়ে। 'ইতিহাসের প্রেত' হয়েই থেকে যাবে সে পালামৌ জেলার গল্পগাথায়।

মৃত্যুর মুহূর্তে তিলক অনর্গল করে দিয়ে গিয়েছিল লাল্‌কির উচ্ছল জলধারা। তার স্বপ্নের লাল্‌কি, বাঁধ ভেঙে উন্মত্ত আবেগে ছুটতে পেরেছিল। মৃত্যু দিয়ে প্রমাণ করেছিল সে, ইট - সিমেন্ট - কংক্রীটের উপরেও নগণ্য এক মানুষ ভারী হতে পারে। অভিজিৎও বাঁধ ভেঙেছিল। মুক্তধারারা স্রোত মায়ের মত তাকে কোলে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। আসলে অভিজিৎ কিম্বা তিলক - নদীর মুক্তিতেই তারা মুক্তি পায়। যখের মতই তারা আগলে রাখতে চায় নদী - আকাশ - পাখির গান। যন্ত্র বা যান্ত্রিকতা তারা বোঝে না। বোঝে প্রাণের আবেগ - মানুষের প্রাণ কিম্বা নদীর মন। ব্যক্তিগত বাঁধ বিরোধিতার ক্ষেত্রে অভিজিৎ বা তিলক যেন একেক জন গঙ্গারাম কালুণ্ডিয়া। আদিবাসী সংগঠকের মত অবশ্য পুলিশ মারে না তাদের। নিজেরাই মরে বাঁধ ভাঙতে গিয়ে। একলা মানুষের এমন অজস্র বিচ্ছিন্ন লড়াই-ই কয়েক দশক পথ পেরিয়ে খুঁজে নেয় সাংগঠনিক শক্তি - বাঁধবিরোধী লড়াইয়ের সংগঠিত রূপ। লাল্‌কি থেকে নর্মদা পর্যন্ত পৌঁছে যায় সে ধারা।

।।তথ্যঋণ।।

১। 'বিতর্কিকা' পত্রিকা, পরিবেশ সংখ্যা-৫, 'পরিবেশের বিপন্নতা ও বড় বাঁধের রাজনীতি', জয়া মিত্র।

২। 'Silenced River: The Ecology and Politics of Large Dams by Patrick Macculey, Orient Longman, 1998